(iv) দুটি তথ্যের কখনোই একই সংকেত হতে পারবে না।

গবেষণার তথ্যের সংকেতায়নের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায়। এগুলি হল—প্রাক্ সংকেতায়ন, পরবর্তী সংকেতায়ন ও প্রান্ত সংকেতায়ন।

(ii) তথ্য প্রবেশন (Data entry): তথ্য কেবলমাত্র সংগ্রহ করলেই গবেষণার কাজ শেষ হয় না। সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এই বিশ্লেষণের জন্য তথ্যগুলিকে বর্গীকরণ বা শ্রেণিকরণ করে সুবিন্যস্ত করতে হয়।

প্রথাগত পদ্ধতিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে তথ্য সংকেতায়ন করে সংকেতপত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে পরিগণক বা কম্পিউটার-এর সাহায্যে এই কাজটি করা হয়। কারণ তাহলে অনেক দ্রুততার সাথে ও অনেক নির্ভুলভাবে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ করা সম্বন্ধ হয়। তাই বর্তমানে সংকেতপত্র থেকে তথ্যাবলী কম্পিউটার ফাইলে দাখিল করা হয়। এই সংকেতপত্রে কম্পিউটার কার্ডের মতই **আশিটি** স্তম্ভ থাকে। সংকেতকারক তথ্যসংকেত নির্দিষ্ট স্তম্ভে লিখে রাখে অবশ্য বর্তমানে সংকেতপত্র ছাড়াই এই কাজ করা যায়। যেমন টেলিফোনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য CAT 1 পদ্ধতিতে সরাসরি কম্পিউটার প্রবেশ করানো যায়। বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে অতিদ্রুত ও শুদ্ধভাবে সংকেত ফাইল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

(iii) সারণী বিন্যাস (Tabulation): তথ্য গণনা বলতে বোঝায় বিভিন্ন শ্রেণি বা বর্গে কতগুলি তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয় তা গণনা করা। তবে তথ্য গণনার কাজ শুরু করার আগেই তথ্য বিশ্লেষণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হয়। এই গণনার কাজে মেশিনের সাহায্যও নেওয়া যাতে পারে। তবে তথ্যগণনার ক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্য সাধারণত নেওয়া হয় যখন তথ্যের পরিমাণ অনেক বেশী হয় এবং যেখানে আড়াআড়ি সারণী বিন্যাস (Cross tabulation) করা হয়।

(iv) তথ্য বিশ্লেষণ (Data analysis): গবেষণার ক্ষেত্রে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা বলা যায় গবেষণার মূল কাজ। এর আগে পর্যন্ত যেসব কাজ করা হয়েছে সেগুলি সবই আনুষঙ্গিক কাজ বা বলা যায় গবেষণার ভিত তৈরীর কাজ। তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল পাওয়া যায়। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণে হয়। পরিসংখ্যাণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্যগুলির বিভিন্ন পরিসংখ্যানমূলক পরিমাপ করা হয়। যেমন, তথ্যগুলির যৌগিক গড় (A.M.), গুণোত্তর গড় (H.M.), সম্যক পার্থক্য (S.D.), বিচ্যুতি (variation), সহ সম্পর্ক বা সহগমন (correlation) প্রতিগমন (regression) ইত্যাদি। আবার প্রাপ্ত ফলের তাৎপর্যও (significant) পরিমাণ করা হয়। এসব পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও গবেষণার বিষয় বা উদ্দেশ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুতরাং তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কতকগুলি সম্পর্কযুক্ত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রায়। এগুলি হল—

(a) অবিন্যস্ত তথ্য বা উপাত্তগুলিতে কতকগুলি বর্গে বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা।

(b) উল্লিখিত শ্রেণিগুলিকে সংকেতায়িত করা ও সারণী-বিন্যাস করা।

(iii) তথ্যগুলির মধ্যে সমরূপতা (Uniformity) রয়েছে কিনা তা যাচাই করা কারণ তথ্যের মধ্যে সমরূপতা না থাকলে তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয়।

সুতরাং সম্পাদনার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিকৃত করা যায়—

(i) তথ্যের নির্ভুলতা বা সঠিকতা ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান।

(ii) অন্যান্য তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিকতা স্থাপন করা।

(iii) সংগৃহীত সমস্ত তথ্য সমরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া।

(iv) তথ্যের মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

(v) তথ্যের সন্নিবেশকরণ যেন সংকেতায়ন (Coding) ও গণনার (Tabulation) উপযোগী হয়।

(2) তথ্যবলীর সঙ্কোচন, সংক্ষেপায়ন ও ব্যবহাররোপ যোগ্যতা (Briefing and making useable the data collected) :

তথ্যবলী সম্পাদনার পর তথ্যাবলীর সংক্ষেপায়ন শুরু হয়। বস্তুত: সংগৃহীত বিপুল তথ্যাবলী গবেষকের কাছে ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। এই বিশাল তথ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। তাই এদের সংক্ষিপ্ত করতেই হয়। এই সংক্ষেপায়নের কাজ সবসময় হাতে করা সম্ভব হয় না বলে বর্তমানে পরিগণনা বা কম্পিউটারের সাহায্যে নেওয়া হয়। পরিগণকের মাধ্যমে এই কাজ করতে হলে সংকেতায়ন আবশ্যিক। কারণ সংকেতায়নের মাধ্যমে তথ্যগুলিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তন করা হয়। এছাড়াও অবিন্যস্ত তথ্যগুলি কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তন করা হয়। এছাড়াও অবিন্যস্ত তথ্যগুলি সংক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন তালিকায় তথ্যগুলিকে সাজানো হয় এবং টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়। এর ফলে অবিন্যস্ত তথ্যগুলি সুবিন্যস্তরূপ পায় এবং সেগুলি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। এছাড়াও এভাবে তথ্যগুলিকে সংগঠিত করার ফলে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করাও সহজ হয়। এই কাজ প্রধানত: তিনটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। এগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

(i) সংকেতায়ন (Coding) : সংকেতায়ন হল সংগৃহীত তথ্যের কোনো সংখ্যা সংকেত বা মান দেওয়ার প্রক্রিয়া যাতে উপযুক্ত শ্রেণিতে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মেশিনের মাধ্যমে যখন তথ্য গণনা বা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা হয় তখন সংকেতায়নের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বস্তুত: তথ্যের সাংকেতিক ভাষা তৈরী করা সংকেতায়ন নামে অভিহিত হয়। সংকেতায়ন করার জন্য চারটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। এগুলি হল—

(i) গবেষণার সমস্যা ও উদ্দেশ্যের উপযুক্ত হতে হবে;

(ii) একটি শ্রেণিবিভাজন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে;

(iii) বহু তথ্য-সংকেত অন্তর্ভুক্ত করার মত ব্যাপ্তি থাকতে হবে; এবং

হিসাবে গণ্য হয়। আরো বেশী নিবিড় সমীক্ষণের মাধ্যমে নির্দেশকগুলি চিহ্নিত করে এই ব্যতিক্রমী এককদের শ্রেণিভুক্ত করতে হয়।

4. সব তথ্যের সংকেতায়ন করা: সব তথ্যকেই নির্দেশক অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ ও সংকেতায়িত করতে হয়, এপ্রসঙ্গে নিউম্যান (Neuman) তিন ধরনের শ্রেণিবিভাজনের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল— (i) অবাধ শ্রেণি বিভাজন, (ii) অক্ষীয় শ্রেণিবিভাজন ও (iii) নির্বাচিত শ্রেণিবিভাজন।

(i) অবাধ শ্রেণিবিভাজন (Open Coding): সংকলিত তথ্যাবলীর বা তথ্যায়নের প্রথম পাঠে এই সংকেতায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্যের বিভিন্ন উৎসগুলিকে সতর্ক নিরীক্ষণের মাধ্যমে মূল ঘটনা, বিষয় ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে সংকেতায়ন করা হয়।

(ii) অক্ষীয় শ্রেণিবিভাজন (Axial Coding): তথ্যাবলীর দ্বিতায় পাঠে এই শ্রেণিবিভাজন করা হয়। এক্ষেত্রে সংকেতায়ন সরাসরি তথ্যের সাথে সম্পর্কীত থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক ধারণা থেকে বিমূর্ত ধারণায়, প্রাথমিক শ্রেণি থেকে সংযুক্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটে। এরূপ শ্রেণিবিভাজন প্রাথমিক শ্রেণিবিভাজনের সহায়ক হয় এবং প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগকে আরো বেশী স্পষ্ট বিমূর্ত করে।

(iii) নির্বাচিত শ্রেণিবিভাজন (Selective Coding): এটি সংগৃহীত তথ্যাবলীর চরম বা শেষ পর্যায়। এক্ষেত্রে আগের সংকেতায়ন সূত্রে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রধান বিষয় চিহ্নিত করে ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট শ্রেণিগুলির তথ্যাবলী বিশদভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) :

গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই গবেষণার ফলাফলের উদ্ভুত হয়। এই কাজ মূলত: তিনটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়। এগুলি হল—

(1) তথ্যবলীর সম্পাদনা ও সংক্ষিপ্ত

(2) বিশাল তথ্যভাণ্ডারকে সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহারযোগ্য করা এবং

(3) পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করা। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(1) তথ্যবলীর সম্পাদনা (Editing) : তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রথম কাজটি হল সংগৃহীত অবিন্যস্ত তথ্যগুলি সম্পাদনা করা। সম্পাদনার উদ্দেশ্য হল তথ্যের ভুল-ভ্রান্তিগুলি চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় সংশোদন ঘটানো। এটি একটি নিয়মমাফিক কাজ হলেও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সাথে এই কাজ করতে হয়। সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেসব কাজ করতে হয় সেগুলি হল:

(i) তথ্যের সম্পূর্ণতা যাচাই করা এবং তথ্যের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকলে তা দূর করা।

(ii) তথ্যের সঠিকতা বা নির্ভুলতা যাচাই করা এবং কোনো অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা দূর করা।

(iii) ভ্রান্ত নিশ্চয়তাবোধ: এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল নিজ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গবেষকের ভ্রান্ত নিশ্চয়তার ধারণা।

(iv) সামান্যীকরণের (Generalisation) অসুবিধা: একক-বিশেষ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যকে সামান্যীকরণ করা যায় না কারণ প্রতিটি একক-বিশেষ স্বতন্ত্র।

(v) নির্ভরযোগ্যতা ও সিদ্ধতা: একক-বিশেষ সমীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ অন্য কোনো গবেষক একই একক বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালালেও সমরূপ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

2. (চ) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ (Date Processing and Anslysis) :

তথ্য কেবলমাত্র সংগ্রহ করলেই হয় না, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করা দরকার। এজন্য প্রথমে তথগুলিকে সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত করা দরকার। কারণ সংগৃহীত তথ্যগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকলে সেগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। তথ্য সুবিন্যস্তকরণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—তথ্যের প্রকৃতি এবং গবেষণার উদ্দেশ্য। তাই গুণবাচক তথ্যনির্ভর ক্ষেত্র গবেষণার এবং পরিমাণগত তথ্যনির্ভর নিরীক্ষণমূলক গবেষণায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ আলাদা ধরনের হয়।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing) :

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বলতে বোঝায় সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণের উপযোগী করে তোলা। কারণ সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রথম পর্যায়ে অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে বলে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে অসুবিধা হয়। তাই অবিন্যস্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ উপযোগী করার উদ্দেশ্যে প্রথমে সুবিন্যস্ত এবং সংক্ষিপ্ত করা হয়। আর এই কাজটি করা হয় তথ্যগুলিকে ধারণা ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীকরণ বা বর্গীকরণের (classification) মাধ্যমে। বর্গীকরণ করার প্রক্রিয়া হল গুণবাচক সংকেতায়ণ (qualitative coding)। গুণবাচক সংকেতায়ণ প্রকৃতপক্ষে গুণবাচক বর্গীকরণ। এই কাজের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল নিম্নরূপ:

1. **তথ্যাবলী থেকে কি চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট করা:** সংগৃহীত তথ্যগুলি গবেষণার উদ্দেশ্যের নিরিখে বর্গীকরণ করা প্রয়োজন। কারণ তথ্যগুলিকে যেকোনোভাবে বর্গীকরণ করলেই চলে না। উদ্দেশ্যমুখী বিশ্লেষণ করার উপযোগীরূপে বর্গীকরণ করতে হয়।

2. **শ্রেণি বিভাজনের নির্দেশকসমূহ নির্দিষ্ট করে শ্রেণিবিভাজন করা:** তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালাগুলি ভালভাবে পাঠ করলে শ্রেণিবদ্ধকরণের একটি সাধারণ ধারণা জন্মায়। অনেক সময় গবেষণার শুর থেকেই শ্রেণি বিভাজনের একটি ধারণা গড়ে উঠে। বস্তুত শ্রেণিবিভাজনের নির্দেশকগুলি প্রথমে বেছে নিয়ে শ্রেণিবিভাজন তৈরী করাই সাধারণ নিয়ম।

3. **শ্রেণিগুলিকে তথ্যানুগ করা:** প্রাথমিকভাবে নির্দেশকগুলিকে চিহ্নিত করে তথ্যগুলি শ্রেণিবদ্ধ করতে হয়। তবে কিছু তথ্য থাকে যেগুলি কোনো শ্রেণির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় না। এগুলি ব্যতিক্রমী একক

(iv) তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Data collection process): গবেষণার একক নির্ধারণের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল তথ্য সংগ্রহ। গবেষণা নক্শায় তথ্যসূত্রের ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে হয়।

(v) তথ্যের সাথে প্রস্তাবনার সম্পর্ক স্থাপন (Linking data with proposition): এটিই হল একক-বিশেষ গবেষণার অন্তিম স্তর। সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে গুণবাচক সংকেতায়নের (Qualitative Coding) মাধ্যমে কতকগুলি বিশেষ ধরন (pattern) নির্দেশ করা হয় এই স্তরে।

একক-বিশেষ সমীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of case study): একক-বিশেষ সমীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণায় কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতিটি অসুবিধা থেকেও মুক্ত নয়। নিচে এ-সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

সুবিধাগত দিক (Advantages) :

(i) পদ্ধতিগত নমনীয়তা: এক্ষেত্রে গবেষক পদ্ধতিগত বাঁধা-ধরা নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। সমীক্ষণের প্রয়োজনে গবেষক যেকোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত ও বহুজন নথি পর্যালোচনা ইত্যাদি পদ্ধতি তথ্য সংগ্রাহক বা গবেষক প্রয়োজনমত অনুসরণ করতে পারে।

(ii) স্বাভাবিক পরিবেশে সমীক্ষণ: গবেষণার একককে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সমীক্ষণ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে স্বত:স্ফুর্ত ও যথাযথ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

(iii) নিবিড় সমীক্ষণ: মনে করা হয় যে মাত্র একটি এককের নিবিড় সমীক্ষণের মাধ্যমে গবেষক কোনো গবেষণামূলক প্রশ্ন সম্বন্ধে সুগভীর ও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও মূল প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরও এর মাধ্যমে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(iv) প্রকল্প নির্মাণ: একক-বিশেষ সমীক্ষা পরবর্তী কোনো গবেষণার পরিচায়ক সংবাদ উপস্থাপনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি অন্বেষণমূলক গবেষণার ভূমিকা গ্রহণ করে পরবর্তী গবেষণার প্রশ্ন প্রকল্প তৈরীতে সাহায্য করে।

(v) তত্ত্ব যাচাইকরণ: একক-বিশেষ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য প্রচলিত কোন তত্ত্বের সত্যায়ন, পরিবর্তন বা পরিশীলন করতে সাহায্য করে।

অসুবিধাজনক দিগ (Disadvantages):

(i) ব্যয়সাপেক্ষ: এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাপেক্ষ। এছাড়াও তথ্য বিশ্লেষণে প্রচুর সময় লাগে।

(ii) বিষয়গত পক্ষপাত: এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি-গবেষক বা তথ্যসংগ্রহকারীকে কোনো বাধা-ধরা নিয়ম মেনে কাজ করতে হয় না বলে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রভাব ও পক্ষপাত কাজ করে। অর্থাৎ পদ্ধতিটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়।

(i) অন্তর্নির্বিষ্ট সমীক্ষা (Intrinsic case study): এই ধরনের সমীক্ষায় গবেষক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একক বিশেষকে কোনো তত্ত্ব নির্মাণ ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে জানতে চায়। যেমন, কোন শিশু, রোগী, অপরাধী বা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত দিকগুলি সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য যখন সমীক্ষা চালানো হয় তখন তাকে অন্তর্নির্বিষ্ট সমীক্ষা বলে।

(ii) উপায়মূলক সমীক্ষা (Instrumental case sutdy): এই ধরনের একক-বিশেষের বৈশিষ্ট্যগত দিকের বিশদ ও নিবিড় সমীক্ষরণ করা হয় পরবর্তী কোনো গবেষণার পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য বা কোনো তত্ত্বকে আরও পরিশীলিত (refinement) করার জন্য।

(iii) একক-সমষ্টির সমীক্ষা (Collective case studies): এই ধরনের সমীক্ষার একাধিক একক-বিশেষ পরম্পরাক্রমে সমীক্ষণ করা হয়ে থাকে। এরূপক্ষেত্রে পূর্ব একক থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী এককের সমীক্ষণ দ্বারা সমর্থিত বা অসমর্থিত হয়। একক-সমষ্টি সমীক্ষণ কোনো ঘটনা বা সমস্যার তত্ত্ব গঠনে সহায়ক হয়।

(iv) নিয়ন্ত্রিত তুলনামূলক একক-বিশেষ সমীক্ষা (Disciplined–comparative case study): কোনো তত্ত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে এরূপ সমীক্ষার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। এধরনের সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্য কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে সত্যায়িত বা অপ্রমাণিত করতে পারে। যেমন অপরাধসংক্রান্ত একটি ধারমা বা তত্ত্ব হল—অসামাজিক সংসর্গ অপরাধ প্রবণতার জন্ম দয়ে। এই ধারমা বা তত্ত্বটি একক-বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। একক-বিশেষ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে ঐ তত্ত্ব বা ধারণাটি সিদ্ধ হলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বা ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধ না হলে সেটির পরিবর্তন বা পরিমার্জন নির্দেশ করে।

একক বিশেষ সমীক্ষার নক্শা (Desing of Case Study): একক বিশেষ সমীক্ষা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়। তাই এর নক্শায় কয়েকটি বিশেষ দিকে উল্লেখ করা হয়। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(i) প্রশ্ন গঠন (setting of questions): অন্যান্য পদ্ধতির মত এখানেও প্রথমে গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন করতে হয়। এই প্রশ্নগুলি কে, কি, কেন, কখন, কিভাবে ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে।

(ii) সম্বন্ধসূচক প্রস্তাবনা (Relational propositions): এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়কে কোনো বিশেষ দিকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রস্তাব করা যেতে পারে যে বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর দক্ষতা ও শিক্ষকদের সহযোগিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক।

(iii) গবেষণার একক নির্ধারণ (Deciding units of research): গবেষণার বিষয় বা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণামূলক প্রশ্নসাপেক্ষ গবেষণার একক নির্ধারণ করা হয়। গবেষণার বিষয়-ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রশ্ন যদি হয় সহযোগী শিক্ষকদের ভূমিকা তাহলে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের একক হয় সহযোগী শিক্ষক। আবার পাঠদান পদ্ধতির ভূমিকা যদি গবেষণামূলক প্রশ্ন হয় তাহলে গবেষণার একক হয় পাঠদান পদ্ধতি বা রীতি।

(5) প্রশ্নমালার প্রাক্‌পরীক্ষণ (Pretesting of questionnaire) : প্রশ্নমালা গঠনের শেষ পর্যায় হল প্রাক্ পরীক্ষণ, প্রশ্নমালা তৈরী করার সময় প্রথমে একটি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করতে হয়। এরপর এই খসড়া প্রশ্নমালার মাধ্যমে অল্প কয়েকজন উত্তরদাতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে প্রশ্নমালার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করা হয়। এই উত্তরদাতারা মূলপর্বের উত্তরদাতা নাও হতে পারে। বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী বা সহকর্মীদের নিয়ে এই পরীক্ষাপর্ব চালানো যেতে পারে। তবে এরূপ পরীক্ষা সর্বত্র চালানো যায় না, অর্থাৎ প্রাক্ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন অবিবাহিত সদস্যদের উপর পরিবার পকিরল্পনা কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্নমালা পরীক্ষা করা যায় না। প্রাক্ পরীক্ষণকালে উত্তরদাতাদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নমালাটি পরিমার্জিত করা হয়। যেমন উত্তরদাতারা যদি খসড়া প্রশ্নমালার কোনো প্রশ্নকে অর্থহীন বলে মনে করে তাহলে ঐ প্রশ্ন প্রশ্নমালা থেকে বাদ দেওয়াই বিধেয়। এছাড়াও উত্তরদাতারা বিভিন্ন প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর দিচ্ছে তার উপরও প্রশ্নমালার চূড়ান্তকরণ নির্ভর করে। যেমন উত্তরদাতাদের উত্তর যদি "জানি না", "প্রযোজ্য নয়", "কোনো উত্তর নেই" বা "উত্তর দিতে সমর্থ নেই" ইত্যাদি ধরনের বা সমধর্মী বা নিয়ন্ত্রিত উত্তর হয় তাহলে প্রশ্নগুলির ত্রুটি বা অসুবিধানজক দিকগুলি জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হয়। এইভাবে প্রাক্ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে গবেষণার মূলপর্বে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। **মোজার** (Moser) ও **কালটন** (Kalton)-এর মতে প্রশ্নমালার উপযুক্ততা বিচারের ক্ষেত্রে প্রাক্ পরীক্ষণ একটি আদর্শ প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য হয়।

4. একক বিশেষ সমীক্ষা পদ্ধতি (Case Study Method) :

গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ এককদের পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার স্বীকৃত পন্থা হিসাবে গৃহীত হলেও গবেষণা সংশ্লিষ্ট একক-বিশেষত্ত (Case study) তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। মনোসমীক্ষণ ও রোগ নিরূপণ প্রক্রিয়ায় এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও পরিমাণবাচক গবেষণায় এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী না হলেও গুণবাচক গবেষণায়, বিশেষত: জীবনীমূলক গবেষণায় (Biographical research) এই পদ্ধতি উপযোগী বলে গণ্য হয়।

একক বিশেষ সমীক্ষা হল তথ্য সংগ্রহের এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কোনো এককের নিবিড় পর্যালোচন করে কোনো ঘটনার উপাদান, কারণ, ইত্যাদি সম্পর্কীত সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী সংগ্রহ করা যায়। এই এককগুলি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ক্রমে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অর্থাৎ এককগুলি ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, জেলা, জনসমষ্টি ইত্যাদি হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পটভূমিতে (inthe context of natural history) তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়। এভাবে সংগৃহীত তথ্য একক-বিশেষের সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ এবং নিবিড় তথ্যচিত্র উপস্থাপনা করে।

একক বিশেষ সমীক্ষার বিভিন্ন ধরণ (Types of Case Study) : একক বিশেষ সমীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হল নিম্নরূপ:

হবে। এই স্তরে কোনো স্পর্শকাতার প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু পরবর্তী স্তরের প্রশ্নাবলীর সহায়ক তথ্য জ্ঞাপক প্রশ্ন এ স্তরে থাকা প্রয়োজন। এরপর মধ্যভাগে সাধারণ বিষয়ের প্রশ্নগুলি করতে হয় ও যুক্তিবোধ্য ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এছাড়াও একই বিষয়ের প্রশ্নগুলি একসাথে সন্নিবেশিত করা দরকার এবং প্রশ্নগুলির পূর্বাপর সম্পর্ক দেখা দরকার। প্রশ্নমালার একেবারে শেষের দিকে স্পর্শকাতর বিষয়ের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ প্রশ্নমালার শেষদিকে এধরনের প্রশ্ন থাকলে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

(3) প্রশ্নের শব্দচয়ন ও ব্যাপ্তি (Selection of word and length of question): প্রশ্নে শব্দের ব্যবহার উত্তরপ্রাপ্তিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। প্রশ্নের প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও যথাযথ হওয়া দরকার। প্রশ্নমালায় প্রশ্ন দেখার একটি সাধারণ সূত্র হল কম কথায় প্রত্যাশিত বিষয়টি প্রকাশ করা। যেক্ষেত্রে একটি শব্দই যথাযথ অর্থ প্রকাশ করতে সমর্থ সেক্ষেত্রে একাধিক শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘ প্রশ্ন উত্তরদাতার বেশী সময় নষ্ট করে বলে তার উত্তর দেওয়ার আগ্রহ কমে যায়। এছাড়া প্রশ্ন বোঝার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দেয়। ডাকে পাঠানো প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা বেশী হয়। প্রশ্নের শব্দ চয়নে আর একটি বিবেচনার দিক হল শব্দের যথার্থ মান নির্ণয় করা। শিক্ষিত উত্তরদাতাদের জন্য নির্মিত প্রশ্নমালায় যে শব্দ ব্যবহার করা যায় অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত উত্তরদাতাদের জন্য লিখিত প্রশ্নমালার প্রশ্নে একই শব্দ ব্যবহার করা যায় না, প্রশ্ন তৈরীর সময় গবেষককে অবশ্যই উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাথায় রাখতে হবে। আবার প্রশ্নে কথ্য শব্দ সীমিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে কথা কথ্য শব্দ ব্যবহার করা গেলেও সাধারণ ক্ষেত্রে কথ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটে না। সবশেষে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে দেখতে হবে যে প্রশ্নের শব্দ স্পষ্ট, অর্থবহ ও দ্ব্যর্থহীন।

(4) প্রশ্নমালার সার্বিক আকার (Overall format of questionnaire) : প্রশ্নমালার বিষয়দফা, তাদের ক্রমবিন্যাস এবং প্রশ্নের শব্দ নির্বাচনের পর প্রশ্নমালার সার্বিক আকার সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে হয়। **ডেভিড ডুলে** (Devid Dooley) বলেছেন যে দৃশ্যত: প্রশ্নমালা স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং, সহজবোধ্য হওয়া দরকার। এক প্রশ্ন থেকে পরের প্রশ্নে যাওয়া যেন সহজ হয়। প্রতিটি প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা ও পরিচায়ক সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে একসাথে বেশী প্রশ্ন না রেখে প্রশ্নগুলি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা উচিত। এর সুবিধা হল, উত্তরদাতা যে বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই বিভাগের উত্তর দিয়ে থাকে। অযথা সব ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না। এছাড়া প্রয়োজনবোধে উত্তরদাতার নাম, তারিখ, পরিচয়জ্ঞাপক সাংকেতিক সংখ্যা ইত্যাদি দেওয়ার মত জায়গা রাখতে হয়। এগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য সাধারণত: প্রশ্নমালার উপরদিকে ডান বা বাম কোনো নির্দিষ্ট জায়গা রাখা হয়। প্রশ্নমালার উপরে থাকে গবেষণা সংস্থা বা গবেষকের পরিচয় ও প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য। এছাড়াও মুক্তপ্রান্ত প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করার জন্য যাতে প্রশ্নমালার যথেষ্ট জায়গা থাকে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। বস্তুত: প্রশ্নমালার অবয়বই উত্তরদাতাকে উত্তর দিতে উৎসাহিত করে। যদিও এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই তবুও প্রশ্নমালার আকার ছোটো হলেই ভাল হয়। উত্তরতাদাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রশ্নমালা শেষ হয়।

(vi) এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতার সম্মুখীন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে উত্তরদাতার বিকৃত তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকে।

প্রশ্নমালা তৈরীর বিচার্য বিষয়সমূহ (Considerations in Questionnaire Design) :

গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয় সেটি হল প্রশ্নমালাটি যেন প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হয়। কারণ গবেষণার ফলাফল প্রশ্নমালার মাধমে সংগৃহীত তথ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তাই প্রশ্নমালায় যদি কোনো গলদ থাকে তাহলে গবেষণার উদ্দেশ্যসাধন ব্যহত হয় এবং গবেষক ভুল পথে পরিচালিত হয়। তাই প্রশ্নমালা তৈরী খুবই সতর্কতা ও যত্নের সাথে সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত: প্রশ্নমালা তৈরীর ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়।

1. বিষয়দফা (Items): একটি প্রশ্নে কেবলমাত্র একটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। একটি প্রশ্নে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে উত্তরদাতা যেকোনো একটির উত্তর দিয়ে থাকে। ফলে অন্য বিষয়টি বাদ পড়ে। এছাড়াও উত্তরের একটি বিষয় অপর একটি বিষয় থেকে ভিন্ন হওয়া দরকার, যাতে একটি উত্তরের সাথে অপর উত্তরটি জটলা না বাঁধে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, একটি বন্ধ প্রান্ত ও তার উত্তর হল নিম্নরূপ:

তুমি কতদিন অন্তর অসুস্থ হও?

(i) বছরে একবার বা তার কম

(ii) মাসে একবার থেকে চারবার

(iii) সপ্তাহে একবার

(iv) সপ্তাহে একবারের বেশী।

এখানে উত্তরদাতা সপ্তাহে একবার অসুস্থ হলে তার উত্তর হবে (ii) নং বা (ii) নম্বরের যেকোনো একটি। এক্ষেত্রে উত্তরের বিকল্পগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় উত্তরদাতার উত্তর বাছায় অসুবিধা হয়। এছাড়াও কোনো স্পর্শকাতর বিষয় প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। কারণ এধরনের উত্তর বিশেষ পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও তাদের মধ্যে সত্যতা বিশেষ থাকে না বলে নির্ভরযোগ্যতাও থাকে না। যেমন, তুমি কি ঘুষ নাও? এধরনের প্রশ্নের উত্তর শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয় না, উত্তরদাতার উত্তর দেওয়ার মানসিকতাকেই নষ্ট করে দেয়। ফলে উত্তরদাতা অসহযোগী হয়ে পড়ে।

(2) প্রশ্নের ক্রমবিন্যাসে (Order of question): প্রশ্নতালিকায় একাধিক প্রশ্ন দেওয়া থাকে। প্রশ্নমালায় প্রশ্নগুলির ক্রমবিন্যাস সুপরিকল্পিতভাবে করা দরকার। প্রশ্নের এই ক্রম উত্তরদাতার প্রত্যাখ্যানের হার এবং উত্তরপ্রাপ্তির হার নির্ধারণ করে থাকে। এ ব্যাপারে **নিউম্যান**-এর (Neuman) পরামার্শ হল প্রশ্নতালিকাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে—শুরু, মধ্যভাগ ও শেষভাগ। প্রশ্নতালিকার শুরুতে কেবলমাত্র সেসব প্রশ্নই থাকবে যেগুলি উত্তরদাতার কাছে সহজ, সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, উৎসাহব্যাঞ্জক ও মনোরম বলে মনে

প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits And Demerits of Questionnaire Method):

প্রশ্নমালা পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত ও পছন্দমাফিক পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। গেুলি নিচে তুলে ধরা হল।

সুবিধা :

(i) অন্য পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতিতে অনেক দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(ii) পরিচালনার দিক থেকে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকারীদের খুব বেশী দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

(iii) যেক্ষেত্রে তথ্যসরবরাহকারী অর্থাৎ উত্তরদাতারা বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে উপযোগী বলে গণ্য হয়।

(iv) যেহেতু একই সাথে সকল উত্তরদাতার কাছ থেকেই তথ্য চাওয়া হয় তাই এই পদ্ধতিতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটে।

(v) কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয় যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়।

(vi) এইরূপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হলে উত্তরদাতারা বাহ্যিক প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকে ফলে নির্ভরযোগ্য, বৈধ ও অর্থবহ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

(vii) যেহেতু উত্তরদাতারা নিজেরাই তথ্য সরবরাহ করে তাই তথ্যের মৌলিকত্ব বজায় থাকে এবং ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে।

(viii) এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

অসুবিধা :

(i) উত্তরদাতারা উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহী না হওয়ায় অনেক সময়ই সম্পূর্ণ তথ্য পেতে অসুবিধা হয় এবং এর বিরূপ প্রভাব গবেষণার উপর পড়ে।

(ii) উত্তরদাতার অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও অপাঠ্য উত্তর সামগ্রিক তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়াকেই অনেকসময় বানচাল করে দেয়।

(iii) গবেষণার বিষয়ের উপর যদি গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয় না।

(iv) এই পদ্ধতির মধ্যে নমনীয়তা খুবই কম। কারণ প্রশ্নমালার প্রশ্ন পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা যায় না। ফলে তথ্যসংগ্রহে অসুবিধা হয়।

(v) প্রশ্নমালা তৈরীর ক্ষেত্রে কোনো গলদ থাকলে তা পুরো গবেষণা প্রক্রিয়াকেই বানচাল করে দেয়।

হলে ঐ প্রশ্নের ছাঁচ প্রশ্ন বলে। সাধারণত পর্যবেক্ষণের একক (Units of observation) প্রকৃত আলোচনার একক (final unit of analysis) থেকে পৃথক হলে এধরনের প্রশ্নতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন গুচ্ছ নমুনাচয়ন প্রক্রিয়ায় (cluster sampling) কোনো পরিবার প্রধান পর্যবেক্ষণ একক হলেও প্রকৃত পর্যবেক্ষণের একক হয় পরিবারের সদস্যরা। এক্ষেত্রে পরিবারের কর্তাকেই প্রশ্ন করে পরিবারের সকল সদস্যদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রতিটি সদস্যসংক্রান্ত তথ্যাবলী একসাথে একটি ছাঁচে লিপিবদ্ধ করা হয়।

(vi) মুক্তপ্রান্ত ও বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নাবলী (open-ended and closed-ended questions): প্রশ্নমালায় দু'ধরনের প্রশ্ন থাকে—মুক্তপ্রান্ত ও বদ্ধপ্রান্ত। মুক্ত প্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনও উত্তর দেওয়া থাকে না। যেমন, দূরদর্শনের কোন্ অনুষ্ঠান তুমি দেখতে ভালবাস? তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? এধরনের প্রশ্ন মুক্তপ্রাপ্ত প্রশ্নের উদাহরণ। গবেষণায় যখন উত্তরদাতার স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফূর্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয় তখন মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নের ব্যবহার ঘটে।

পক্ষান্তরে বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নের একাধিক উত্তরের ইঙ্গিত দেওয়া থাকে যেগুলির মধ্য থেকে একটি উত্তর উত্তরদাতাকে পছন্দ করতে হয়। বৃহদাকার সমীক্ষা ও পরিমাপবাচক গবেষণায় এধরণের প্রশ্নের ব্যবহার বেশী ঘটে। এরূপ প্রশ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণায় শ্রম, সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটে। এছাড়া পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে উত্তর বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। অবশ্য এধরনের প্রশ্ন গঠনের ক্ষেত্রে কিছু বিতর্ক দেখা দেয়। যেমন—প্রশ্নের কতগুলি উত্তর দেওয়া হবে? নিরপেক্ষ পছন্দের উত্তর থাকবে কিনা? পছন্দের উত্তরের ক্রমবিন্যাস কিরূপ হবে? ইত্যাদি। বাস্তবক্ষেত্রে পছন্দের উত্তর দুটি বিকল্প হতে পারে, যেমন—'হাঁ বা না' অথবা 'মানি (agree) বা মানি না (disagree)' আবার বহু বিকল্পও হতে পারে, যেমন—'উদারনীতি অর্থনৈতিক প্রগতির' বাহক এই বক্তব্য সম্পর্ক তোমার অভিমত কি? এই প্রশ্নের বহু বিকল্প উত্তরগুলি হল—সঠিক, আংশিক সঠিক, জানি না, আংশিক ভুল ও সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত: দুই বিকল্প উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন প্রশ্নমালায় কম থাকে কারণ এরূপ প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে উত্তরদাতার পছন্দের স্বাধীনতা থাকে না। ফলে গবেষকের পক্ষপাতযুক্ত উত্তর দিতে বাধ্য হয়। তবে অল্পশিক্ষিত উত্তর দাতাদের ক্ষেত্রে এরূপপ্রশ্ন ব্যবহার করা সুবিধাজনক হয়। তবে বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য বেশি বিকল্প উত্তরই প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ উত্তরদাতা চিন্তাভাবনার অবকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু অতি বেশি বিকল্প বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। আবার এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে মধ্যপদে নিরপেক্ষ মত অন্তর্ভুক্ত করাও বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই নিরপেক্ষ উত্তরের বিপক্ষে বলা যায় যে, উত্তরদাতা প্রকৃতপক্ষে ভিন্নধর্মী উত্তর দিতে চাইলেও অন্য বিকল্প না থাকায় ঐ নিরপেক্ষ উত্তর পছন্দ করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকসময় উত্তরদাতার কোনো উত্তর না থাকলেও কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐ নিরপেক্ষ উত্তর পছন্দ করতে হয়। আবার অনেকসময় প্রকৃত উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যও ব্যক্তি নিরপেক্ষ উত্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে—যা একেবারেই কাম্য নয়।

(i) দুই-উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন (Dichotomous questions): যখন প্রশ্নতালিকায় কোনো প্রশ্নের কেবলমাত্র দুটির উত্তর দেওয়া থাকে, যাদের মধ্যে একটি ধনাত্মক ও অন্যটি ঋনাত্মক এবং যেকোনো একটির উত্তর বেছে নিতে হয় তখন তাকে দুই-উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন বলে। উদাহরণ স্বরূপ, "উত্তরদাতা ইংরাজী জানে কিনা.....হ্যাঁ বা না" এরূপ প্রশ্ন দুই-উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন।

(ii) বহু পছন্দমূলক প্রশ্ন (Multiple choice questions): এরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্নতালিকায় তিন থেকে পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। প্রতিটি উত্তরই অপরের পরিবর্ত হিসাবে গণ্য হয়। উত্তরদাতাকে যেকোনো একটি উত্তর পছন্দ করে নির্বাচন করতে হয়। প্রশ্নতালিকাটি প্রণয়ন করার সময় প্রণয়নকারীকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে সমস্ত সম্ভাব্য উত্তরগুলি উল্লেখ করা সম্ভব হয়।

(iii) ঘটনা সম্বলিত এবং মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন (Factual and opinion questions): প্রশ্নতালিকার বেশিরভাগ প্রশ্নই ঘটনা সম্বলিত ও মতামত সংক্রান্ত হয়ে থাকে। উত্তরদাতার পেশা, আয়, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন ঘটনা সম্বলিত প্রশ্ন বলে গণ্য হয়। অন্যদিকে মতামত সংক্রান্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে উত্তরদাতার মতামত জানতে চাওয়া হয়। জনমত সমীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্নই বেশি থাকে। যেমন, প্রাণদণ্ড থাকা উচিৎ কি উচিৎ নয় মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন বলে গণ্য হয়। এধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল যে-কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ উত্তরদাতার প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য হেতু একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান হল প্রথমে ঘটনা সম্পর্ক প্রশ্ন করা ও তারপর মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন করা।

(iv) শঙ্কা সঞ্চারী প্রশ্ন (Threatening questions): প্রশ্নমালায় কোনো সংবেদনশীল বিষয় সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উত্তরদাতার মনে শঙ্কার সৃষ্টি করে। এধরনের প্রশ্নকেই শঙ্কা সঞ্চারী প্রশ্ন বলে। অবৈধ কাজকর্ম, অসামাজিক আচরণ, মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক আয় ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী এধরণের প্রশ্ন হিসাবে গণ্য হয়। এইসব প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে বিষয়টি এড়াতে চায়। কাজেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে উত্তরদাতার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারলে ও গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(iv) সাপেক্ষ প্রশ্ন (Contingency questions): এধরনের প্রশ্নে দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশটির উত্তরের সাপেক্ষে উত্তরদাতাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্তরদাতার কাছে প্রাসঙ্গিক কিনা তা প্রথম প্রথম প্রশ্নের উত্তরের নিরিখে নির্ধারিত হয় বলে দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে সাপেক্ষ প্রশ্ন বলে। যেমন পারিবারিক জীবন সম্পর্কে উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে—(i) আপনি কি বিবাহিত? (ii) কতবছর আগে আপনি বিবাহ করেছেন? এদের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ-সূচক হলে তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করতে হয়।

(v) ছাঁচ প্রশ্ন (Matrix questions) একটি প্রশ্নের মাধ্যমে একাধিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চাওয়া

(a) অনেকসময় উত্তরদাতা উত্তর দেওয়ার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আতিশয্য করে ফেলে, সাক্ষাৎকার যিনি গ্রহণ করে তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং অতিরিক্ত অংশ বাদ দিতে হবে।

(b) সাক্ষাৎকারে উভয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্রজনিত ফাঁকা থাকা চলবে না। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ এমন হবে যাতে উত্তর দেওয়া ও তার অর্থ অনুধাবন করার মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকে।

(c) অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে এবং কখনো কখনো তাকে বিদ্রুপ করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে এ ধরনের উত্তরদাতাকে খুব কৌশলের সাথে ও মাথা ঠান্ডা রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

(d) আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষত: অনভিজ্ঞ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা উত্তরদাতার আচরণের কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং তার রিপোর্টে ঐ উত্তরদাতার তথ্যকে বিকৃতরূপ দেয়। এরূপ হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(e) উপরের ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারের যেসব বিষয় কার্য-কারণ সম্পর্কিত সেগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

3. প্রশ্নাবলী পদ্ধতি (Questionnaire Method) :

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতিরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। গবেষণার বিশ্লেষণের উপকরণ বা চলক (variable) সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষককে একটি উপায় স্থির করতে হয়। এখানে উপায় বলতে প্রশ্নমালা বা প্রশ্নতালিকা তৈরী করতে হয় । এই তালিকায় কতকগুলি রীতিবদ্ধ প্রশ্ন থাকে এবং তালিকাটি তথ্য সরবরাহকারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে প্রশ্নমালাটির সাথে একটি পত্রও তথ্য সরবরাহকারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটি পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ দেওয়ার আবেদন করা হয়। প্রশ্নাবলীর মধ্যেই উত্তর লিপিবদ্ধ করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং কিভাবে প্রশ্ন তালিকাটি পূরণ করতে হবে সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া থাকে। উত্তরদাতা গবেষকের সাহায্য ছাড়াই প্রশ্ন তালিকাটি পূরণ করে ও সাধারণত ডাকযোগে গবেষকের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এই প্রশ্নতালিকা সংগঠিত বা অসংগঠিত হতে পারে। সংগঠিত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ও তাদের নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া থাকে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তরগুলির মধ্যে যথাযথ উত্তরটি বেছে নিতে হয়। কিন্তু অসংগঠিত প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া থাকে না, উত্তরদাতারা নিজ নিজ ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

প্রশ্নতালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরন (Types of Questionnaire) :

গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে যে প্রশ্নতালিকা তৈরী করা হয় তাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রশ্নসংশ্লিষ্ট উত্তরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ:

জটিলতা থাকে এবং বিষয়টি পরিমাণবাচক নয়। যেমন—কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যার গভীরতা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে **একক বিশেষ সমীক্ষায়** (case study) যে সাক্ষাৎকার চালানো হয় তাকে গুণবাচক সাক্ষাৎকার বলে। কারণ এরূপ সাক্ষাৎকার সমস্যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করা হয়।

(ii) পরিমাণবাচক সাক্ষাৎকার (Quantitative interview) **:** পরিমাণবাচক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হল কোন ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে বহুজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উপায়। লোকগণনা বা আদমসুমারির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সাক্ষাৎকারে সঠিক উত্তর পাওয়ার উপায় (means of getting correct response in an interview) :

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন গবেষক সেই সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি অনুসরন করবে যার মাধ্যমে সে সঠিক নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। তথ্যে বিচ্যুতির পরিমাণ যত কম হবে গবেষনার ব্যয় ও জটিলতা তত কম হবে। সাধারণত: তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নির্ভর করে গবেষক সাক্ষাৎকার কতটা কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে পারে তার উপর। এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও সাক্ষাৎকারকে ফলপ্রসূ করার জন্য একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি নিচের নিয়মাবলী মেনে চলে সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

(i) সাক্ষাৎকার শুরুর আগে গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে অবশ্যই যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক ও সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে।

(ii) উত্তরদাতা যাতে তার বক্তব্য পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে তার জন্য সুযোগ দিতে হবে।

(iii) সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারে গবেষককে সচেতন থাকতে হবে। সাক্ষাৎকার চলাকালীন হাল্কা কৌতুক সাক্ষাৎকারকে ফলপ্রসু ও উদ্দেশ্যাভিমুখে করতে সাহায্য করে।

(iv) সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উত্তরদাতা যাতে প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং ভেবেচিন্তে উত্তর দেয় সেদিকে গবেষকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গবেষক বা উত্তরদাতা যদি অমনোযোগী হয় তাহলে বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে।

(v) গবেষক যদি উত্তরদাতার দেওয়া উত্তরের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেয় এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে ভাল কাজ হয়। উত্তরদাতা অধিক উৎসাহের সাথে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করে এবং আরো ভালভাবে উত্তর দেয়।

(vi) যদি উত্তরদাতার উত্তর গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে সন্দেহজনক মনে হয় তাহলে জের মূলক প্রশ্ন করে সন্দেহের নিরসন ঘটাতে হবে।

এগুলি ছাড়াও গবেষকদের যেসব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—(a) প্রাপ্ত উত্তর বা তথ্যের মধ্যে তুলনা করা যায় না ; (b) এরূপ সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা আনুপাতিকভাবে কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ; (c) এরূপ সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়; এবং (d) তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অত্যন্ত শ্লথ বলে নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী নয়।

(2) উত্তরদাতাদের সংখ্যার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল:

(i) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal interview)**:** ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে একই সময়ে মাত্র একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এরূপ সাক্ষাৎকার মুখোমুখি হয় এবং বিষয় সম্বন্ধে উত্তরদাতার ব্যক্তিগত মতামত জানা যায়।

(ii) দলবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Group interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার একই সাথে নেওয়া হয়। যেক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত অভিমত সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে এধরনের সাক্ষাৎকার চালানো হয়।

(3) উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার দু'ধরনের। এগুলি হল:

(i) রোগ নির্ণায়েক সাক্ষাৎকার (Diagnostic interview)**:** কোনো ঘটনা ঘটার পিছনে কি কারণ রয়েছে তার জানার জন্য যখন সাক্ষাৎকার চালানো হয় তখন তাকে রোগ নির্ণায়ক সাক্ষাৎকার বলে।

(ii) চিকিৎসামূলক সাক্ষাৎকার (Therapeutic interview)**:** রোগ নির্ণায়ক সাক্ষাৎকারের মত এই সাক্ষাৎকার ততখানি সুনির্দিষ্ট নয়। এরূপ সাক্ষাৎকারে কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রয়োজনমাফিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(4) পদ্ধতিগতভাবে সাক্ষাৎকার আবার দু'ধরনের, এগুলি হল:

(i) দিক্ বা দিশাহীন সাক্ষাৎকার (Non-directional interview): এরূপ সাক্ষাৎকারকে স্বাধীন বা অসংগঠিত সাক্ষাৎকারও বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকারের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না বা দিক্ নির্দেশ করে না। এরূপ সাক্ষাৎকারে কোনো পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালাও ব্যবহার করা হয় না। উত্তরদাতাকে কেবলমাত্র উত্তর দিতে ও তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

(ii) নির্দিষ্ট দিক বা দিশাযুক্ত সাক্ষাৎকার (Focused interview) **:** সাক্ষাৎকারের এই পদ্ধতি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন—রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জানার প্রয়োজন হয়। এরূপ সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য হল যে এরূপ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কোন বিষয় সম্বন্ধে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, আবেগ এবং মানসিক গঠন সম্পর্কিত তথ্য জানা সম্ভব হয়।

(5) বিষয়ের উপর ভিত্তি করেও সাক্ষাৎকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ: (i) গুণবাচক সাক্ষাৎকার (Qualitative interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকার চালানো হয় যেক্ষেত্রে বিষয়গত

সুতরাং এরূপ কোন বিষয়ের উপর যদি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাহলে তথ্য পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠে। অনেকসময় আবার তথ্য পাওয়া গেলেও তা সম্পূর্ণভাবে বা পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় না।

(ii) সাধারণভাবে সাক্ষাৎকার হল একটি কলা (art)। সাক্ষাৎগ্রহণকারী বা গবেষকের এই কলায় ব্যুৎপত্তি না থাকলে সাক্ষাৎকার সাফল্য পায় না। অনুরূপভাবে যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তার মধ্যে যদি কম পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা থাকে তাহলেও সঠিক তথ্য পেতে অসুবিধা হয়।

(iii) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি কোনরূপ ভুল ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সাক্ষাৎকার ভ্রান্তিমূলক হয়ে পড়ে।

(iv) আবার অনেকসময় মানব চরিত্রের কতকগুলি বিশেষ দিক সাক্ষাৎকারে বেশি গুরুত্ব পায় এবং অন্যদিক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ গবেষক বৃত্তিগত বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অথচ পরিবেশগত বিষয়গুলির উপর সেভাবে গুরুত্ব না দেওয়ায় সংগৃহীত তথ্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সাক্ষাৎকারের ধরন বা প্রকারভেদ (Types of Interview) :

গবেষণায় তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকারের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিটি সাক্ষাৎকার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সাক্ষাৎকারকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায়।

(1) রীতি বা নিয়ম অনুসারে সাক্ষাৎকারের ধরণগুলি হল:

(i) নিয়মানুগ বা রীতিবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Formal interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকারে গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে সাক্ষাৎকার নেয় এবং সাক্ষাৎকারের উত্তরগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে লিপিবদ্ধ। এরূপ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের ক্রম (order) এবং যোগসূত্রের (sequence) উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাদের প্রত্যেককে একই ধরনের প্রশ্ন করা হয় যাতে প্রাপ্ত উত্তরগুলির মধ্যে তুলনা করা যায়। এরূপ সাক্ষাৎকারের সুবিধাগুলি হল—(a) সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে তুলনা করা যায়, (b) সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্যতা (uniformity) দেখা যায় এবং (c) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কম দক্ষতা থাকলেও তথ্য সংগ্রহে অসুবিধা হয় না।

(ii) **নিয়মবহির্ভুত সাক্ষাৎকার** (Informal interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পরিবেশ পরিস্থিতি ও উত্তরদাতার প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্নগুলি পরিমার্জন, সংশোধন করতে পারে এবং তাদের ক্রমবিন্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে যাতে উত্তরদাতা খোলা মনে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এমনকি এরূপ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের যে তালিকা থাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে অর্থাৎ কিছু নতুন প্রশ্ন যোগ করতে পারে বা তালিকার কিছু প্রশ্ন বাদ দিতে পারে। এধরনের সাক্ষাৎকারের **সুবিধাগুলি** হল—(a) এরূপ সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা কোনো চাপের মধ্যে থাকে না এবং খোলামনে উত্তর দিতে পারে এবং (b) উত্তরদাতার কাছ থেকে নির্ভেজাল উত্তর পাওয়া যায়। ফলে

ব্যবহার ঘটে। যেমন, টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা, বাইনোকুলার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পর্যবেক্ষকদের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এসব যন্ত্রের ব্যবস্থাও আগাম করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গবেষক তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হলে সংগৃহীত তথ্য অনেক বেশী উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য হয়।

2. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method) :

গবেষণার তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারী তথ্যপ্রদানকারী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে ও মুখোমুখি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। সাধারণত: তথ্য সংগ্রহকারী গবেষণার বিষয় সম্পর্কীত কতকগুলি প্রশ্ন তথ্য প্রদানকারীকে করে এবং তার উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখে। তথ্য সংগ্রহের এটি একটি প্রত্যক্ষ ও মৌলিক পদ্ধতি। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোনো গবেষক স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে কোনো গবেষণা চালাতে চায় তাহলে সে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্কুলে যাবে, শিক্ষকদের সাথে দেখা করবে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। এরূপ পদ্ধতি এতটাই উপযোগী যে নিরক্ষর ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কারণ তথ্য সংগ্রহ করা হয় কথোপকথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি দু'ভাবে প্রয়োগ করা হয়। **নিরীক্ষামূলক গবেষণায়** গবেষক পূর্বনির্দিষ্ট সুবিন্যস্ত প্রশ্নমালা নির্ভর প্রশ্নের মাধ্যমে সদস্যদের উত্তর লিপিবদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে **ক্ষেত্র গবেষণায়** কথোপকোথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেকারণে এরূপ সাক্ষাৎকার হয় অসংগঠিত, অনিয়ন্ত্রিত ও অন্তর্ঘন (in-depth)। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা বুঝতেই পারে না যে তারা সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। এই সাক্ষাৎকারে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা ও অর্থ বোঝা যুগপৎ ঘটে। যাইহোক না কেন, সাক্ষাৎকার পদ্ধতির **সুফল বা সুবিধাগুলি** নিচে তুলে ধরা হল।

(i) এই পদ্ধতিতে গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী ও তথ্যজ্ঞাপনকারী অর্থাৎ যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠে। এর ফলে তথ্য সংগ্রহে সুবিধা হয়।

(ii) যেহেতু সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর মুখোমুখি ঘটে তাই প্রশ্ন বা উত্তর খুব পরিষ্কারভাবে জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়।

(iii) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাসম্পর্কীত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় না। উত্তরদাতার আবেগজনিত দৃষ্টিভঙ্গী, গোপন অনুপ্রেরণা ও অন্যান্য মানব চরিত্রের দিকগুলি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই উন্মোচিত হয়। সেজন্য সাক্ষাৎকারকে অনেক সময় অধি-পর্যবেক্ষণ বলা হয়।

(iv) এছাড়াও এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্য সূত্র বা উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতাও যাচাই করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির **কুফল বা অসুবিধাগুলি হল** নিম্নরূপ:

(i) এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করা যায় না, গোপনে লিখে ব্যক্ত করা যায়।

সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ চালায় তখন তাকে সংগঠিত পর্যবেক্ষণ বলা হয়। অর্থাৎ কাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, কখন পর্যবেক্ষণ করা হবে, কাদের পর্যবেক্ষণ করা হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে আগাম পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনা অনুসারে পর্যবেক্ষণের কাজ পরিচালিত করে তখন তাকে সংগঠিত পর্যবেক্ষণ বলা হয়। বস্তুত: এরূপ পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক তার উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টাকে প্রয়োগ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলক গবেষণার নক্শা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপাট বা পরিমণ্ডল থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে। যেহেতু প্রাকৃতিক ঘটনার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না এবং এ ব্যাপারে আগাম অনুমান করা সম্ভব হয় না তাই পরিকল্পনা করে পর্যবেক্ষণ চালানোও যায় না। তাই এরূপ পর্যবেক্ষণে কোন পরিকল্পনা থাকে না এবং প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয় না। অজ্ঞাত কোন প্রাকৃতিক ঘটনার প্রকৃতি স্বরূপ উন্মোচন বা আবিস্কার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে গবেষণার ক্ষেত্র অনুসারে গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষকের ভূমিকা ঠিক করতে হয়। এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক বিচারবোধ দ্বারা পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে গবেষণার সাফল্যের পিছনের সঠিক পদ্ধতির ব্যবহার ও গবেষকের সঠিক ভূমিকা পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদক্ষেপসমূহ (Stepe in organising observation):

যেসব গবেষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তাঁদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

(1) **পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি ও সীমা ঠিক করা :** গবেষণার বিষয়ের বা গবেষণা প্রকল্পের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গবেষককে একটি তথ্য সংগ্রহের একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরী করতে হবে। এই রূপরেখায় কি ধরনের পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং কোন্ বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং কোন্ বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বা কোন্ বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হবে না সেগুলি উল্লেখ করা হয়। এর ফলে পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যমুখী হয় এবং অহেতুক শ্রম, সময় ও প্রচেষ্টার অপচয় ঘটে না।

(2) **পর্যবেক্ষণের সময়, স্থান এবং বিষয়:** তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময়ের জন্য চালানো হতে পারে। আবার পর্যবেক্ষণ কোনো পরীক্ষাগারে বা খোলা জায়গায় চালানো হতে পারে। এছাড়াও পর্যবেক্ষণ সার্বিক হবে না আংশিক হবে, তাও আগাম ঠিক করতে হয়।

(3) **পর্যবেক্ষক নির্বাচন:** তথ্য সংগ্রহের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য-এর উপর নির্ভর করে উপযুক্ত মানের কর্মী নির্বাচন করা প্রয়োজন। যেক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে দলের কর্মীদের বাছাই করে দল গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

(4) **প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা:** পর্যবেক্ষণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক যন্ত্রপাতির

(i) যেহেতু পর্যবেক্ষকের প্রকৃত ভূমিকা গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে অজ্ঞাত থাকে তাই তারা স্বাভাবিক আচরণ করে। এর ফলে তথ্য বিকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

(ii) কেবলমাত্র এরূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারাই কতকগুলি আবেগজনিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায়।

(iii) এভাবে সংগৃহীত তথ্য খুবই নির্ভরযোগ্য হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির **অসুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতিতে যেহেতু পর্যবেক্ষক নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে তাই এই পদ্ধতিটিকে **অনৈতিক** (unethical) এবং গোপনীয়তা ভঙ্গের কারণ বলে গণ্য করা হয়।

(ii) এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক দলের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং দলে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে দলীয় আচরণের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে এবং দলের স্বাভাবিক আচরণ ব্যহত হয়। এর প্রতিফলন ফলাফলের উপরও পড়ে বলে সংগৃহীত তথ্য পুরোপুরি বিশুদ্ধ হয় না।

(iii) যেহেতু পর্যবেক্ষক দলের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকে তাই কিছু কিছু দলীয় আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলত: সংগৃহীত তথ্য পুরোপুরি সঠিক হয় না।

(iv) অনেক সময় পর্যবেক্ষক দলের কর্মের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায় যে দলের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সে নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়। এর ফলেও তথ্যসংগ্রহ ব্যাহত হয় কারণ সে নিজেকে দলের সঙ্কট মোকাবিলায় নিয়োজিত হয় এবং তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি অগ্রাহ্য হয়।

অবশ্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে অনেক সময় পর্যবেক্ষক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে ও গবেষণার উদ্দেশ্য তাদের কাছে ব্যক্ত করে। এরূপক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকা হয় সাংবাদিকের ভূমিকার মত।

(2) অনঅংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Non participants or Direct observation) :

এরূপ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত, এক্ষেত্রে গবেষক বা পর্যবেক্ষক দলীয় কাজকর্মে কোনও রকম অংশগ্রহণ না করে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সদস্যরা বেশীরভাগ সময় জানতেই পারে না যে তাদের নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। কারণ এরূপ পর্যবেক্ষণে গবেষকই অপ্রকাশিত থাকে। যেমন কোনো রেলস্টেশনে যাত্রীদের ট্রেনে ওঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যা রেলযাত্রীরা জানতে পারে না। এক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকা নিরীক্ষামূলক এবং অনেকটাই পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকার মত। এরূপ পর্যবেক্ষণে গবেষকের নিজস্ব সত্ত্বা সংরক্ষিত থাকে এবং বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা বজায় থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না এবং তাদের আচরণের অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আরো দুটি উপবিভাগ রয়েছে। এগুলি হল—(i) **সংগঠিত পর্যবেক্ষণ** ও (ii) **অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ।**

সংগঠিত পর্যবেক্ষণ হল কারণ ও যুক্তি নির্ভর একটি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। গবেষক যখন পর্যবেক্ষণ

নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি আবেগজনিত বিষয়ে যেমন 'পছন্দ-অপছন্দ' পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে।

(ii) কোন কোন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ফলাফল অলীক বলে গণ্য হয়।

(iii) যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ চালাতে হয়, তাই এই পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল ও খুব বেশি সময় সাপেক্ষ।

(iv) অনেক সময় যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তারা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য জেনে যায় এবং তারা কৃত্রিম আচরণ করে। এরূপক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে।

(v) এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত শ্লথ হওয়ায় পর্যবেক্ষক এবং যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, উভয়েই হতাশ হয়ে পড়ে।

(vi) পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণকারীর অনুধাবন ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। ফলে পদ্ধতিটি নৈর্ব্যক্তিক নয়, ব্যক্তি নির্ভর। কাজেই ফলাফলে ব্যক্তিগত ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা অনভিপ্রেত।

(vii) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য যেহেতু পর্যবেক্ষকের অবহিত থাকে তাই বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিশেষ গুরুত্ব পায় যা কাম্য নয়।

(viii) কোন কোন সময় এই পদ্ধতি গবেষণার নৈতিক দিককে উপেক্ষা করে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ধরন (Types of Obeservation Method)

পর্যবেক্ষকের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল—

(1) অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ এবং

(2) অনঅংশ-গ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ

(1) **অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ** (Peraticipant observation) : এই পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় প্রধান। এই পদ্ধতিতে গবেষক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিশদ তথ্যসংগ্রহ করে। এরূপ পর্যবেক্ষণকে ছদ্ম পর্যবেক্ষণ (disguised observation) বলা হয়। এই ভূমিকা গ্রহণের প্রকৃতি হয় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী। গবেষককে এক্ষেত্রে দীর্ঘসময় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে বসবাস করতে হয়। এমনকি ভাল না লাগলেও তাকে গোষ্ঠীর সাথে থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে একীকরণ ও একাত্ম হতে পারলে তবেই গবেষক গোষ্ঠীর আচার-আচারণ, জীবনবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলিকে **স্প্রেডলি** (Spreeadley) নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল—স্থান, কর্তা, কাজ, বস্তু, ক্রিয়া, ঘটনা, সময়, লক্ষ্য এবং অনুভূতি। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে জণ মেজ (John Madge) মন্তব্য করেছিলেন যে পর্যবেক্ষকের হৃদয়ের সাথে গোষ্ঠীর সদস্যদের হৃদয়ের সংযোগ ঘটলে তবেই তাকে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক বলা যাবে। এরূপ পর্যবেক্ষণের **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

এদের সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল।

(1) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) :

তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতিটির ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। বিশেষত: উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আচরণমূলক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার ঘটে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবেক্ষণ হল কোন বস্তুর দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শজনিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ হল **দেখা** (watching) এবং **শোনার** (listening) একত্রিত রূপ। বস্তুত: বিভিন্ন ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে তার পিছনে **কার্য-কারণ সম্পর্ক** (cause-effect relationship) অনুধাবন করাই হল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি : পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহকারীকে ব্যক্তিগতভাবে চোখ ও কানের প্রয়োগ ঘটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তাই এটি একটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

(ii) পর্যবেক্ষণ ও লিখন : পর্যবেক্ষক বা তথ্যসংগ্রহকারী খুবই সতর্কতা ও যত্নের সাথে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করে ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখে।

(iii) নির্বাচিত ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য সংগ্রহ : এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ সবসময় একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চালিত হয়। পর্যবেক্ষক কেবলমাত্র সেসব তথ্যই সংগ্রহ করে যেগুলি গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক।

(iv) কার্য-কারণ সম্পর্ক : পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে কোন ঘটনা ঘটার পিছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুধাবন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Observation Method)

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতিটি সহজ ও সরল বলে যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সহজেই ব্যবহার করা যায়।

(ii) এটি অনেক বেশী বাস্তবানুগ কারণ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়।

(iii) এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য অনেক বেশী নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয়।

(iv) গবেষণার প্রকল্প প্রণয়নে এই পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী।

(v) যখন কোনো সমস্যা বা বিষয়কে গভীরভাবে সমীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তখন এই পদ্ধতি উপযোগী হিসাবে গণ্য হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির **অসুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

(i) সব ধরনের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয় না কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে

(ii) স্বল্পমেয়াদী তথ্য সংগ্রহ সমীক্ষা দীর্ঘমেয়াদী তথ্য সংগ্রহ সমীক্ষা থেকে অধিক উপযোগী বলে গণ্য হয়।

(2) **প্রযুক্ত বিষয়,** যার অন্তর্ভুক্ত হল—

(i) তথ্য সংগ্রহকারীকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন তা সংগ্রহকারীর রয়েছে।

(ii) গবেষণার বিষয়ের প্রকৃতি ও আকার কি ধরনের তথ্যের প্রয়োজন তা ঠিক করে দেয়।

(iii) যেক্ষেত্রে গবেষণার সমস্যাটি একাধিক স্বাধীন বিষয়ের সাথে যুক্ত সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে কম সংখ্যক তথ্য সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত।

(iv) কিন্তু যেক্ষেত্রে গবেষণার সমস্যাটি একাধিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে স্বাধীন সমীক্ষা চালানো যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাদের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় থাকা দরকার। এভাবে সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারী দলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

(3) **মানবিক বিবেচ্য বিষয়:** এর অন্তর্ভুক্ত হল যদি তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবর্তনজনিত মানবিক বাধা বা প্রতিক্রিয়া বর্তমান থাকে তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বাধা দূর করা সম্ভর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া ঠিক না।

(4) **অন্যান্য বিষয়সমূহ:** প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি হল—

(i) **সময়সীমা:** তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণার পরিকল্পনায় যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ করতে হবে।

(ii) **ব্যয় :** তথ্য সংগ্রহের ব্যয় যেন এব্যাপারে অনুমিত ব্যয়ের বেশি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(iii) নির্ভুলতা : সংগৃহীত তথ্য যেন যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারটিও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ (Methods of Primary Data Collection) :

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এদের মধ্যে নিচের চারটি পদ্ধতির ব্যবহার সর্বাধিক। এগুলি হল—

(1) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ;

(2) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ;

(3) প্রশ্নাবলী পদ্ধতি ;

(4) একক বিশেষ সমীক্ষা পদ্ধতি।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য বা উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	প্রাথমিক তথ্য	মাধ্যমিক তথ্য
1. তথ্যের উৎস	মূল বা প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়।	প্রকাশিত বা লিখিত নথি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়।
2. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	সাধারণত: পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	বিভিন্ন প্রকাশিত বা লিখিত নথি সমীক্ষা করে তথ্য সংগৃহীত হয়।
3.পরিখ্যানমূলক প্রক্রিয়াকরণ	এধরনের তথ্যের পরিসংখ্যানমূলক প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয়।	পরিসংখ্যানমুলক প্রক্রিয়াকরণ করার দরকার হয় না কারণ এগুলি সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ করা থাকে।
4. তথ্যের মৌলিকত্ব	প্রাথমিক তথ্য মৌলিক। এরূপ তথ্য ব্যবহারকারীই প্রথম সংগ্রহ করে।	এরূপ তথ্য মৌলিক নয়, পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।
5. সময়	এরূপ তথ্য সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ।	এরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে সাধারণত: বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না।
6. ব্যয়	এরূপ তথ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল। কারণ এজন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়।	এরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যয় আনুপাতিকভাবে কম হয়।
7. তথ্যের নির্ভুলতা	প্রাথমিক তথ্য অনেক বেশি নির্ভুল হয়।	মাধ্যমিক তথ্যের মধ্যে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশি।

গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত: দুধরনের তথ্যই ব্যবহৃত হয়। তবুও এদের মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান সেগুলি নিচে তালিকাকারে তুলে ধরা হল।

(ঘ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Consideration for Primary Data Collection) :

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের বিষয় বা উৎস নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি হল—

(1) **অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়,** যার অন্তর্ভুক্ত হল—

(i) তথ্য সংগ্রহের ব্যয় অর্থাৎ তথ্যের উপযোগিতা এবং ব্যয়ের মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য থাকে।

হল মাধ্যমিক তথ্য। প্রাথমিক তথ্য যেখানে সরাসরি মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত হয় সেখানে মাধ্যমিক তথ্য নথিসূত্রে (paper) সংগৃহীত হয়। নথি বলতে যেকোনো লিখিত উপকরণকে বোঝায় যা গবেষণার বিষয় বা ঘটনা সম্বলিত সংবাদ বহন করে। এগুলি আবার দু'ধরনের—প্রত্যক্ষ বিবরণ নির্ভর নথি ও পরোক্ষ বিবরণ নির্ভর নথি। এই প্রথম শ্রেণির নথিকে 'রেকর্ড' ও দ্বিতীয় শ্রেণির নথিকে রিপোর্ট বলা হয়। জন ম্যাজ (John Madge)-এর মতে 'রেকর্ড' ঘটমান বর্তমানকে নথিভুক্ত করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে রিপোর্ট অতীতের ঘটনার বিবরণ নথিভুক্ত করে, কাজেই পরোক্ষ হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের অসংখ্য নথি গবেষণার তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই নথিগুলিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়—**ব্যক্তিগত নথি** ও **বহুজনীন বা সরকারী নথি**।

(খ) **সুবিধা ও অসুবিধা :** প্রাথমিক তথ্যের মতই মাধ্যমিক বা পরোক্ষ তথ্যেরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। এরূপ তথ্যের সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) **ব্যয়:** প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের মত মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ অতটা ব্যয়বহুল নয়। তাছাড়াও এর অপর এক সুবিধা হল যে তৈরী তথ্য পাওয়া যায়।

(ii) **সময়:** প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তা মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাগে না। অনেক দ্রুত তার সাথে এরূপ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(iii) **তথ্যের পরিধি:** মাধ্যমিক তথ্যের পরিধি বেশ ব্যাপক। এধরনের তথ্য আরো তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

অন্যদিকে এরূপ তথ্যের যেসব অসুবিধা দেখা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) যেহেতু এরূপ তথ্য প্রাথমিকভাবে অন্য কোনো বিষয়ের প্রেক্ষাপটে সংগৃহীত হয়েছিল, তাই এরূপ তথ্য সবসময় গবেষণার প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে।

(ii) এরূপ তথ্য পরিবেশের গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার কারণে অপ্রচলিত বলে গণ্য হতে পারে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা যায় না।

(iii) মাধ্যমিক তথ্যের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রধানত: তথ্যের উৎস এবং তথ্য সংগ্রহের যে অনির্দিষ্ট অনুমান করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে।

(iv) মাধ্যমিক তথ্যের উৎস খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা অনেক সময় বেশ সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

(v) অনেক সময় তথ্যের ব্যাপকতা এতটাই বেশি হয় যে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয়িত হয়।

(ক) তথ্য সংগ্রহের ধরন :

প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্য (Primary Data) : গবেষকের দ্বারা সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ তথ্যকে প্রাথমিক তথ্য বা প্রত্যক্ষ তথ্য বলে এধরনের তথ্য সরাসরি মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষে (theoretical perspective) বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোঠারী (C. R. Kothari) তাঁর Research Methodology- Methods and Techniques গ্রন্থে প্রাথমিক তথ্য সম্বন্ধে বলেছেন যেসব তথ্য নতুনভাবে ও প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং যাদের মধ্যে চরিত্রের মৌলিকত্ব বর্তমান থাকে সেগুলিই হল প্রাথমিক তথ্য (" The primary data are those which are collected afresh and for the first time, and thus happens to be original in character.")। বস্তুত: তথ্য হল গবেষণার কাঁচামাল স্বরূপ। সংগৃহীত তথ্য প্রয়োজনমত সংযুক্ত ও সংগঠিত করা যায়। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্য সততই নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়। কারণ প্রাথমিক তথ্য সবসময়ই অকৃত্রিম উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

(ii) ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য এসব উপাত্ত থেকে পাওয়া যায়।

(iii) এরূপ তথ্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না বলে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

(iv) এরূপ তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্যের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য দিকগুলি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা থাকে।

(v) উপাত্ত বা তথ্যগুলি যাতে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হয় সেজন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা তথ্যের সাথে দেওয়া হয়। কথায় আছে যে গোলাপ থাকলেই কাঁটা থাকবে। প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্যের যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে তেমনি কয়েকটি অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) ব্যয়: প্রাথমিক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা ব্যয়বহুল।

(ii) সময়: এরূপ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রাথমিক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহে শ্রম, সময় ও অর্থের বেশি প্রয়োজন হয়।

(iii) **প্রশিক্ষিতকর্মী :** প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজসাধ্য নয়। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

মাধ্যমিক বা পরোক্ষ তথ্য (Secondary Data) **:** যেসব তথ্য মৌলিক নয়, যেগুলি অপর কোনো ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত এবং সাধারণভাবে প্রকাশিত তাদের মাধ্যমিক বা পরোক্ষ তথ্য বলে। এরূপ তথ্যের পরিসখ্যানমূলক প্রক্রিয়ার (statistically processed) মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ: ভারতীয় রির্জাভ ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত তথ্য বা কোন জার্নাল বা কোনো সরকারী দপ্তর দ্বারা প্রকাশিত তথ্য

(i) গবেষণার সমস্যা সম্পর্কিত ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল পরিকল্পনা।

(ii) গবেষণা চালানোর জন্য যে জনসমষ্টিকে নির্বাচিত করা হয় সেই নির্বাচনে যদি ভুল থাকে তাহলে গবেষণায় ত্রুটির উদ্ভব হয়।

(iii) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নাবলীর (Questionnaire) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হলে অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

(iv) তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভুল পদ্ধতির ব্যবহার।

(v) তথ্য সংগ্রহকারী যদি অসংলগ্ন ও ভুল তথ্য সংগ্রহ করে।

(vi) প্রতিবেদন ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ঝোঁক বা পক্ষপাত।

(vii) গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চলকগুলি (variables) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব।

(viii) প্রকৃত সংখ্যার পরিবর্তে পড় সংখ্যার অপব্যবহার।

(ix) গবেষণা চালানোর জন্য ভুল পদ্ধতির ব্যবহার।

(x) গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে যদি কোনো গলদ থাকে।

উপরের কারণগুলি ছাড়াও নমুনা-বহির্ভূত ত্রুটি আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। তবে উপরের কারণগুলি দূর করতে পারলে গবেষণা অনেকাংশেই ত্রুটিহীন করা সম্ভব হয়।

অনুশীলনী :

০১। নমুনাকরণের অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

০২। এক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলীগুলি কি?

০৩। নমুনাচয়নের মূল পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

১.৭ উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

গবেষণা হল অজ্ঞাত কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। গবেষণার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে গবেষণার অন্যতম মূল কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে দু'ধরণের উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এগুলি হল—(1) প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ উপাত্ত বা তথ্য এবং (2) মাধ্যমিক বা পরোক্ষ উপাত্ত বা তথ্য। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন অনুসন্ধানের কাজে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির (questionnaire method) প্রয়োগ ঘটে। সাধারণত: দেখা যায় এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর উত্তরদাতা দেয় না বা নমুনার অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না।

(iii) উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ত্রুটি : যখন নমুনা থেকে উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন এই উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে তার প্রতিফলন সামগ্রিক প্রক্রিয়ার উপর পড়ে। যেসব কারণে তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি দেখা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(a) তথ্য সংগ্রহকারী যদি তথ্য সংগ্রহে যত্নশীল না হয় তাহলে সংগৃহীত তথ্য ত্রুটিহীন হয় না। যেমন তথ্য সংগ্রহকারী যদি সঠিকভাবে প্রশ্ন না করে বা উত্তর সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তথ্যের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়।

(b) উত্তরদাতার উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাব থাকলে প্রদত্ত উত্তর সঠিক ও যথাযথ হয় না।

(c) যদি প্রশ্নাবলীটি খুব দুর্বল হয় অর্থাৎ ভালভাবে তৈরী করা না হয়।

(d) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে।

(iv) পরিবর্ত : নমুনার অন্তর্ভুক্ত কোনো উপাদান বা ব্যক্তিকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে তথ্যসংগ্রহকারী নমুনার অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিবর্ত ব্যক্তি বা উপাদানের থেকে তথ্যসংগ্রহ করে। এর ফলে নমুনার পরিবর্ত পক্ষপাতের উদ্ভব হয় এবং ফলাফল সঠিক হয় না।

(v) ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ : প্রাপ্ত তথ্য বা উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে গবেষণার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু তথ্য বা উপাত্ত বিশ্লেষণ যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলেও নমুনাকরণ ত্রুটির (sampling error) উদ্ভব ঘটে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে তথ্য সংগ্রহকারী এবং উত্তরদাতা বা তথ্যপ্রদানকারীর পক্ষপাতমূলক আচরণ বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির জন্ম দেয়। তবে অনেক সময় তথ্যসংগ্রহকারী বা উত্তরাদাতার কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক কারণে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও কিছু ত্রুটির উদ্ভব ঘটে। এ ধরণের ত্রুটিকে পক্ষপাতহীন ত্রুটি (unleiased error) বলা হয় এবং এ ধরনের ত্রুটি অনেকাংশে পারস্পরিক ক্রিয়ায় অবলুপ্ত (set off) হয়ে যায় এবং গবেষণার ফলাফলকে বিশেষ প্রভাবিত করে না।

(2) নমুনা বহির্ভূত ত্রুটি (Non-sampling errors) :

নমুনাকরণের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা ভুল না থাকলেই বলা যায় না যে গবেষণা বা সমীক্ষা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত, বস্তুত: গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়েই যেমন—তথ্যসংগ্রহ, তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও তথ্যবিশ্লেষণ ইত্যাদির সময় ত্রুটির উদ্ভব ঘটতে পারে। সুতরাং নমুনাকরণের ক্ষেত্রে ত্রুটি ছাড়াও নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির উদ্ভব ঘটতে পারে এবং এগুলিকে নমুনা-বহির্ভূত ত্রুটি বলে। এগুলি হল—

(iv) নমুনার সমদর্শিতা (homogeneity) পরীক্ষার মাধ্যমে : বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে যে নমুনা তৈরি করা হয় তার মধ্যে জনসমষ্টির সকল চরিত্রই প্রকাশ পেতে হবে। তাই সমদর্শিতা পরীক্ষার মাধ্যমে একটি নমুনার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়।

(v) নিরপেক্ষ নির্বাচন : বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নমুনা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচনে কোন পক্ষপাত বা ঝোঁক না থাকে। নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করা হলে তা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হয়।

(vi) প্রধান নমুনা থেকে নমুনা তৈরীর মাধ্যমে : এটি হল নমুনা থেকে নমুনা তৈরি করা। অনেকসময় নমুনার নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ করার জন্য নমুনা থেকে আরো একটি নমুনা তৈরি করা হয়। এরপর এই নমুনাটি খুবই প্রগাঢ়ভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মূল নমুনার ফলাফলের তুলনা করা হয়। এর ফলে মূল নমুনার কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

(জ) নমুনাগত ও নমুনা বহির্ভুত ত্রুটি (Sampling and Non-sampling errors) :

পরিসংখ্যামূলক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে ভুল বা ত্রুটি সাধারণভাবে দেখা যায় তাদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল (1) নমুনাগত ত্রুটি বা ভুল (Non-sampling errors) এবং (2) নমুনা বহির্ভূত ত্রুটি বা ভুল (Sampling errors)। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(1) নমুনাকরণজনিত ভুল বা ত্রুটি (Sampling errors) :

নমুনার মাধ্যমে সমীক্ষায় বৃহৎ জনসমষ্টির একটি ছোট অংশের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। কাজেই নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মূল জনসমষ্টির ফলাফলের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এমনকি একই জনসমষ্টি থেকে একাধিক নমুনা নির্বাচন করা হয় ও তাদের উপর সমীক্ষা চালানো হয় তাহলেও প্রাপ্ত প্রতিটি নমুনার ফলাফলের মধ্যে অল্পবিস্তার বিচ্যুতি দেখা যায়। এমনকি নমুনাগুলি যদি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয় তাহলেও ফলাফলের মধ্যে এই বিচ্যুতি দেখা যায়। এই বিচ্যুতি বা পার্থক্যকেই ভুল বা ত্রুটি বলা হয় এবং নমুনাকরণের জন্যই এই ত্রুটি বা ভুলের উদ্ভব হয় বলে এরূপ ভুলকে নমুনাগত বা নমুনাকরণজনিত ভুল বলে গণ্য করা হয়। যেসব কারণে নমুনাকরণজনিত ভুলের উদ্ভব ঘটে সেগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

(i) **নমুনা নির্বাচনে ত্রুটি :** উদ্দেশ্যমূলক নমুনা নির্বাচন কখনই নিরপেক্ষ হয় না। কাজেই এরূপক্ষেত্রে ত্রুটি বা ভুলের উদ্ভব হয়। নমুনাকারী যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নমুনার উপাদানগুলিকে নির্বাচন করে তাহলে নমুনাটি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। নমুনা নির্বাচন যতটা অসংগঠিতভাবে হবে নমুনার ত্রুটি বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়।

(ii) **অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান :** যদি নমুনার অন্তর্ভুক্ত সব উপাদানগুলির উপর অনুসন্ধান না চালানো হয় অর্থাৎ কিছু উপাদানকে অনুসন্ধানের বাইরে রাখা হয় তাহলে প্রাপ্ত তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(3) যদি নমুনাকরণের ক্ষেত্রে স্তরভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহলেও কিন্তু নিখুঁত স্তরীকরণনীতি (Principle of perfect stratification) অনুসরণ করা উচিত নয়।

(4) উৎস তালিকার অভাব বা অসম্পূর্ণ তালিকা থেকে নমুনা নির্বাচন করা হলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(5) যদি তথ্য সংগ্রহকারীদের নমুনা নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট গাইডলাইন দেওয়া না হয় তাহলে তারা তাদের সুবিধামত নমুনা নির্বাচন করে। এরূপক্ষেত্রে নমুনার পক্ষপাতহীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(6) এছাড়াও নমুনার উপাদান নির্বাচনের পদ্ধতি যথাযথ ও উপযুক্ত না হলেও নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। জটিল, বিষমপ্রকৃতির এবং বিশাল ব্যপ্তিযুক্ত জনসমষ্টি থেকে নমুনা তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

(7) সবশেষে গবেষক বা সমীক্ষককে সবসময় দেখতে হবে যাতে নমুনা পক্ষপাতশুন্য ও জনসমষ্টির সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

(ছ) নমুনাকরণের নির্ভরযোগ্যতা (Sampling Reliability) :

গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি উদ্দেশ্য গুরুত্ব পায়। এগুলি হল—(i) নমুনাটি অবশ্যই **ঝোঁকশূন্য** ও **নিরপেক্ষ** হবে এবং (ii) **নির্ভরযোগ্য** হবে। একটি নমুনার নির্ভরযোগ্যতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল নমুনার আকার, গবেষণার বিষয়ের সাথে, সাযুজ্য, উপযুক্ততা, জনসমষ্টির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা ইত্যাদি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নিরিখে একটি নমুনার নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা হয়।

(i) নমুনার আকার : নমুনার জনসমষ্টির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নমুনার আকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে দেখা যায় তাদের মধ্যে সরল সম্পর্ক বিদ্যমান। নমুনার আকার যত বড় হবে তার মধ্যে জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তত বেশী হবে। বিপরীতক্রমে নমুনার আকার যত ছোট হবে তার নির্ভর যোগ্যতাও তত হ্রাস পাবে। সেজন্য গবেষক বা সমীক্ষককে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমীক্ষা চালানোর জন্য নমুনাটি উপযুক্ত কিনা।

(ii) নমুনার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে : নমুনার প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা পরীক্ষার মাধ্যমে নমুনার নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নমুনা জনসমষ্টির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে যত বেশী করে প্রকাশ করতে পারবে তার নির্ভরযোগ্যতাও তত বেশি হবে।

(iii) একটি সমান্তরাল নমুনা তৈরির মাধ্যমে : নমুনার নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার জন্য নমুনার সমান্তরাল অপর একটি নমুনা একই জনসমষ্টি থেকে তৈরি করা হয়। সমান্তরাল নমুনাটির নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার পর প্রথম নমুনাটি পরীক্ষা করা হয়। দুটি নমুনার ফলাফল তুলনা করে উভয় নমুনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

নমুনা তৈরি কতকগুলি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেমন—যেক্ষেত্রে জনসমষ্টির সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না, নমুনার উপাদানগুলিকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না এবং যেক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা (pilot study) চালানো হয়।

(iii) **অংশ বা ভাগ নমুনাকরণ :** অংশ বা ভাগ নমুনাকরণ স্তরভিত্তিক নমুনাকরণেরই একটি বিশেষ ধরন। এই পদ্ধতিতে গবেষণার অনর্থবক্ত জনসমষ্টির জ্ঞাত চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এরপর এই প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উপাদান ও মোট জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত উপাদানের মধ্যে অনুপাত বের করা হয়। এরপর অনসন্ধানকারীদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ কোন্ কোন্ শ্রেণীর কোন্ অংশের উপর তারা সমীক্ষা চালাবে। এভাবে সম্পূর্ণ জনসমষ্টি থেকে আনুপাতিভাবে তথ্য সংগৃহীত হয়।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল যে জনসমষ্টির ধরনের উপাদানগুলিকে নিয়ে এক একটি স্তর গঠন করা হয় এবং স্তরগুলি থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। এরফলে সংগৃহীত তথ্য জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করতে অনেকটাই সম্ভব হয় এবং গবেষণার ব্যয়ও হ্রাস পায়। তবে এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হল যে জনসমষ্টির স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে নমুনাকারীর পক্ষপাতিত্ব (biasness) দেখা যায়। এছাড়াও নমুনা নির্বাচনে যেহেতু নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে না। তাই প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে ভুল-ত্রুটির পরিমাণ পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না।

(চ) নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা (Precautions in using Sampling Methods) :

নমুনাকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতি নির্বাচনে প্রথম যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেটি হল নমুনাটি যেন অবশ্যই জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নমুনাটির মধ্যে যদি জনসমষ্টির সকল চরিত্রের প্রকাশ না ঘটে তাহলে ঐ নমুনাকে পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না, কাজেই এরূপ নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা চালালে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নমুনা যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে পড়ে তারজন্য গবেষককে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

(1) যেক্ষেত্রে জনসমষ্টি পরিবর্তনীয় হয় অর্থাৎ জনসমষ্টির চরিত্রগত পরিবর্তন প্রায়শ:ই ঘটতে থাকে সেক্ষেত্রে জনসষ্টির উপর সমীক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারে বারে চালাতে হবে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ বারে বারে সমীক্ষা চালালে জনসমষ্টির চরিত্রগত পরিবর্তন সমন্ধেও ধারণা পাওয়া যায়।

(2) জনসমষ্টি থেকে যে নমুনা নির্বাচন করা হবে তার আকার যেন খুব ছোট না হয়। কারণ বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে যদি ছোট আকারের নমুনা নির্বাচন করা হয় তাহলে তা জনসমষ্টিকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সুতরাং নমুনার আকার এমন হতে হবে যাতে জনসমষ্টির সমস্ত চরিত্রের প্রকাশ পায়। এছাড়াও নমুনা নির্বাচন যেন উদ্দেশ্যভিত্তিক না হয়। কারণ এরূপক্ষেত্রে নমুনার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(i) **বিচারভিত্তিক বা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনাকরণ :** এই পদ্ধতিতে বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নমুনা তৈরীর ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে গবেষক বা অনুসন্ধানকারীর বিচার বিবেচনা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে। যদিও নমুনা গঠনকারী সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করে যাতে নমুনাটি সঠিকভাবে জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তথাপি সর্বোত্তম নমুনা গঠনের ক্ষেত্রে তার বিচার-বিবেচনাই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী বলে গণ্য হয় যখন জনসমষ্টি থেকে খুব কম সংখ্যক উপাদান নিয়ে নমুনা তৈরী করতে হয়। এরূপক্ষেত্রে যদি সরল নিরপেক্ষ নমুনাকরণ পদ্ধতি (simple random sampling) অনুসরণ করা হয় তাহলে কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বা বাদ পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এরূপক্ষেত্রে বিচারভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিৎ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক একটি কোম্পানীর কর্মীদের কার্যকারিতা (effectiveness) নিরূপণের জন্য ঐ কোম্পানীর মোট 100 জন কর্মীর থেকে নিরপেক্ষভাবে 10 জন কর্মীকে বেছে নিয়ে একটি নমুনা তৈরি করা হল। এরূপ নমুনায় হয়তো দেখা যাবে যে কোম্পানীর সব বিভাগের প্রতিনিধিত্ব নেই, একটি বা দুটি বিভাগের কর্মীদের নিয়েই নমুনাটি গড়ে উঠেছে। সুতরাং কোম্পানী সমস্ত কর্মীদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নমুনার ফলাফল সঠিক ধারণা দিতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে ঐ নমুনা সমীক্ষার ফলাফল গবেষণার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত বিচারভিত্তিক নমুনাকরণও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা না হলে গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এছাড়াও এরূপ পদ্ধতির অন্য একটি অসুবিধা হল যে নমুনার ফলাফলের নির্ভরতা যাচাই করার কোন সুযোগ থাকে না।

তথাপি যখন কোন জনসমষ্টির অজ্ঞাত চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য জানার জন্য সমীক্ষা বা গবেষণা চালানো হয় তখন জনসমষ্টিকে প্রথমে বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতকগুলি স্তরে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি স্তর থেকে বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে নমুনার উপাদানগুলি বেছে নেওয়া হয়। এরূপক্ষেত্রে নমুনাটি অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

(ii) **সুবিধাজনক নমুনাকরণ :** যখন নমুনা নির্বাচনে গবেষক বা অনুসন্ধানকারীর সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তখন তাকে সুবিধাজনক নমুনাকরণ বলা হয়। এরূপ নমুনাকরণ যেমন 'সম্ভাবনার' বিষয়টি বিবেচনা করে না তেমনি ব্যক্তিগত বিচারবোধের উপরও নির্ভর করে না। পরিবর্তে নমুনাটি কিভাবে তৈরি করলে গবেষণা চালাতে সর্বাধিক সুবিধা হবে তার উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়। কতকগুলি তৈরি তালিকা যেমন টেলিফোন ডাইরেক্টারী, গাড়ির নিবন্ধন তালিকা থেকে যখন কোন নমুনা তৈরি করা হয় তখন তাকে সুবিধাজনক নমুনাকরণ বলা হয়। এরূপ নমুনাকরণে যদি নিরপেক্ষ নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তথাপি একে নিরপেক্ষ বা ঝোঁকহিন নমুনাকরণ বলে না। এরূপ নমুনার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি কখনই জনসমষ্টির সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সেকারণে এভাবে তৈরি নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট (biased) হয় এবং কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলে গণ্য হয় না। তথাপি এই পদ্ধতিতে